

ধর্ষন ও ইসলাম

Asif Adnan

March 2, 2019

9 MIN READ

স্ট্যানফোর্ডপ্রিয়ন এক্সপেরিমেণ্ট। ১৯৭১ এ অ্যামেরিকার স্ট্যানফোর্ডইউনিভার্সিটিতে চালানো এ এক্সপেরিমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল জেলখানায় বন্দি ও রক্ষীদের মধ্যকার দ্বন্ধের মূল কারণ সম্পর্কে জানা। গবেষকদের ধারণা ছিল বন্দি ও রক্ষীদের মধ্যকার তিক্ত সম্পর্কের কারন হল কিছু কিছু রক্ষীর সহজাত নিষ্ঠুরতা এবং নিষ্ঠুরতাকে উপভোগ করার প্রবণতা।

এক্সপেরিমেণ্টের জন্য বেছে নেয়া হয় ২৪ জন ছাত্রকে। ১২ জন ছাত্র থাকবে বন্দীর ভূমিকায় আর ১২ জন হবে রক্ষী। ১৫ দিনের জন্য ওরা থাকবে গবেষকদের বানানো একটা সাজানো জেলে। পুরো সময়টা ওদের ভিডিও করা হবে। কিন্তু ছয় দিনের মাথায় এক্সপেরিমেণ্ট বন্ধ করে দেয়া হয়। রক্ষীর ভূমিকায় থাকা সাধারণ ছাত্ররা অবাক করা মাত্রার নিষ্ঠুরতা এবং অমানবিক আচরণ দেখাতে শুরু করে। একদল মানুষের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন পাবার পর সাধারণ, নিরামিষ ছাত্রগুলো রাতারাতি যেন একেটা নিষ্ঠুর, বিকৃত দানবে পরিণত হয়।

বন্দী ও রক্ষীদের সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে গিয়ে গবেষকরা অসহায় ও শক্তিশালীর মধ্যকার সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত কিছু ফলাফল আবিষ্কার করেন।

সহজাতভাবে মানুষ ভালো-আমরা ভাবতে পছন্দ করি। কিন্তু বাস্তবতা সব সময় আমাদের পছন্দের এ ধারণাকে সমর্থন করে না। অশউইংয়ের মতো নাৎসি ক্যাম্প, সোভিয়েত রাশিয়ার গুলাগ, গুয়ান্টানামো কিংবা অ্যামেরিকার অসংখ্য ব্ল্যাক সাইটগুলোতে কাজ করা প্রতিটি মানুষ, দশ লক্ষ মুসলিমকে বন্দি করে রাখা চাইনিয় 'রি-এডুকেইশান ক্যাম্প'গুলোর প্রতিটি কর্মী রক্তপিপাসু, সাইকোপ্যাথিক দানব না। এদের অনেকেই আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ। গৃহী মানুষ। জীবনের ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মান-অভিমান করা আর তুচ্ছ জিনিসে খুশি হওয়া মানুষ। শান্তি কমিটির সাথে যারা যুক্ত ছিল তারাও সাধারণ মানুষ - মাটির নিচ থেকে উঠে আশা কোন নিশাচর, অর্ধেক মানুষ অর্ধেক দানব হাইব্রিড না। এদের অনেকেই ছিল এলাকা, গ্রামের সুপরিচিত মুখ। শাহবাগে যারা 'একটা একটা শিবির ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর' স্লোগান দিয়েছে, তারাও সাধারণ মানুষ। উপমহাদেশের ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন সময়ে হওয়া দাঙ্গায় যারা খুন, ধর্ষন আর লুট করেছে তারাও সাধারণ মানুষ। গণপিটুনির সময় একটা জীবন্ত মানুষকে পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলা লোকগুলোও বাসায় গিয়ে মেয়েকে অংক বুঝিয়ে দিতে বসা, স্ত্রীর সাথে খুনসুটি কিংবা ঝগড়ায় ব্যস্ত হওয়া সাধারণ মানুষ। প্রচন্ড ভিড়ে আটকে পড়া মেয়েটার শরীরে সুযোগ বুঝে হাত রাখা ছেলেগুলোও সাধারণ মানুষ। মা-র আদরের ছেলে, বোনের ছোটবেলার দুস্টুমির সাথী।

মানুষ মৌলিকভাবে ভালোও না, খারাপও না। মানুষ হল মানুষ। স্বর্গীয় ও পাশবিক, সাদা ও কালোয় মেশানো। যে মানুষ অবিশ্বাস্য কল্যাণের ক্ষমতা রাখে, সে-ই ক্ষমতা রাখে অচিন্তনীয় নিষ্ঠুরতার। মানুষ নিজের মধ্যে ভালোমন্দ দুটোকেই ধারণ করে। দুটোর ক্ষমতা নিয়েই ঘুরে বেড়ায়। তবে যদি মানুষকে কোনরকম জবাবদিহি ছাড়া ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে অধিকাংশ সময় অধিকাংশ মানুষ খারাপকেই বেছে নেবে। সাধারণ মানুষ প্রায়ই অসাধারণ নিষ্ঠুরতার কাজ করে। এটাই স্বাভাবিক। 'সামস্টিক বিবেক' বলে একটা কথা আছে, সত্য। তবে সামস্টিক নিষ্ঠুরতা আর গণউন্মাদনাও সত্য।

উদাহরণ খুজতে খুব দূরে যেতে হবে না, চারপাশে তাকালেই খুঁজে পাবেন। আমাদের সবারই হয়তো কাউলিলর একরামের ফোন রেকর্ডিংয়ের কথা মনে আছে। তবে একরাম হত্যার কিছুদিন আগেই ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে 'না-মানুষের' লিস্টে নাম উঠে যাওয়া আরেকজন লোকের কথাও আমরা শুনেছিলাম। কারো হয়তো তার সাথে পুরনো হিসেবে মেটানো বাকি ছিল। তাই বেচারি মানুষটা 'না-মানুষ' হয়ে 'বন্দুকযুদ্ধে' মারা যেতে হল। সম্ভবত তাবলীগ করতেন। হয়তো জমিজমা, সম্পত্তি, তুচ্ছ কোন কথা কাটাকাটির রেশ ধরে প্রতিদিনের চেনা কোন লোকই মানুষটার নাম লিস্টে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। একরামকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবার আগে দিন কয়েকের জন্য আমাদের বিবেকের শর্ট টার্ম বিশ্বাসের, আর সাময়িক দুঃখবিলাসের অংশটা আমরা এ

মানুষটার জন্য বরাদ্দ করেছিলাম।

এটা তো একটা উদাহরণ। এ উদাহরণটা না থাকলেও আসলে কিছু যায় আসে না। কারন এমন উদাহরন শতো শতো আছে। দেশে আছে, বিদেশে আছে। বর্তমানে আর অতীতে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে কোন মেয়ের ব্যাপারে 'ও তো প্রস্টিটিউট' গুজব ছড়াবার উদাহরণ আছে। 'পবিত্র প্রেম' একসময় 'বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষন'- এ পরিণত হয়েছে, এমন উদাহরণও আছে। আছে অনলাইনে ছেড়ে দেয়া আসল, নকল, নানা রকম স্টিল ইমেজ আর ভিডিওর। সব উদাহরণ একই মাত্রার না, কিন্তু এগুলোর পেছনে কাজ করা ঘৃণা মৌলিকভাবে একই। ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা বিদ্বেষের কারণে অন্যের ক্ষতি করা। ব্যক্তিগত ঝাল মেটানোর জন্য শক্তিয়ন্ত্রকে ব্যবহার করা। কেউ মিথ্যা অভিযোগ করে, কেউ না-মানুষের লিস্টে নাম উঠিয়ে দেয়, কেউ আরো ক্রিয়েটিভ কিছু খুঁজে বের করে।

মানুষ এমনই। যদি নিয়ম না থাকে, শাস্তি ও শৃঙ্খলার কাঠামো না থাকে তাহলে মিথোলজিকাল মানবতা খুব দ্রুত পাশবিকতা কিংবা হয়তো পৈশাচিকতায়ও পরিণত হয়। উপযুক্ত পরিস্থিতিতে আমরা সবাই সম্ভাব্য অপরাধী। নিয়মের বেড়াজাল ছাড়া আমরা সবাই পশু। বুদ্ধিমান, বুঝদার, হিসেবী -পশু। তাই মানবতা, সামস্টিক বিবেক, মানুষের সহজাত মহানুভবতা, কিংবা বিবেচনাবোধের মত ধারণাগুলোর ওপর আশা রাখলেও, ভরসা করে বসে থাকা যায় না। বিশেষ করে অপরাধ, অপরাধপ্রবণতা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রনের প্রশ্নে। সর্বোত্তমের প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়।

শুধু জানুয়ারিতে বাংলাদেশে ঘটেছে ৫২ টি ধর্ষন, ২২ টি গণধর্ষন এবং ৫টি ধর্ষনের পর হত্যার ঘটনা, জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এ ধর্ষকদের মধ্যে একেবারে অচেনা আগন্তুক যেমন আছে তেমনি আছে প্রেমিক, ক্লাসের সহপাঠী, প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয়, এমনকি ধর্ষিতার আপন পিতাও। ধর্ষকদের বয়সের কোন নির্দিষ্ট রেইঞ্জ নেই। ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষন করেছে ৯ এবং ১২ বছরের দুই শিশু, এমন খবরও আমরা দেখছি। ধর্ষন আমাদের সমাজের জন্য একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে, এটুকুস্পষ্ট। কিন্তু কিভাবে আমরা এ সমস্যা সমাধান করবো, সে প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে স্পষ্ট না। সমাজ হিসেবে, জাতি হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন কিন্তু এখনো সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করায় আগ্রহী না।

তাই আমরা মেতে উঠি 'হারকিউলিস'-কে নিয়ে। যে হারকিউলিস গুম করে, খুন করে। খুন করে গলায় আবার লেমিনেটিং করা কাগজ ঝুলিয়ে দেয়। এবং 'হারকিউলিস' সম্ভবত হাসেও, 'ক্লিন হার্ট', 'ক্রসফায়ার' আর 'বন্দুকযুদ্ধ' আর গুম-খুনের এর অভিজ্ঞতাকে ভুলে গিয়ে বীরবন্দনায় মেতে ওঠা এই আমাদের নিয়ে।

অথবা আমরা মনোযোগ দেই ধর্ষিতার পোশাক, পোশাকের অভাব কিংবা পুরুষ অথবা পুরুষতন্ত্রের দিকে। আমাদের চিন্তা ও আলোচনা আবর্তিত হতে থাকে, 'মেয়েটারই দোষ' আর 'পুরুষত্বই বিষাক্ত' এর মুখস্থ রেটোরিকের গোলকধাঁধায়। আমরা কারো ওপর দোষ চাপিয়ে নিশ্চিত হতে চাই, সেই সাথে দোষীকে চিত্রিত করতে চাই দুঃস্বপ্নের জগত থেকে উঠে আসে কোন আধিভৌতিক জন্তু হিসেবে। আমরা এমন একটা জগত চাই যেখানে ধর্ষিতাকে বেশ্যা বলে কিংবা ধর্ষককে গুলি করে মেরে ফেলে এককালীন ঝামেলামুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা সমস্যার মূলে হাত দেই না।

সবশেষে আমাদের উদ্বেগ, উৎকর্ষা সীমাবদ্ধ থেকে যায় নিউয় সাইকেলের সাথে সাথে নিয়মিত বিরতিতে পরিবর্তিত হওয়া সাময়িক শোক, নিন্দা আর ক্রোধের মাঝে। এ আবেগ মেকি না। কিন্তু প্রশ্ন হল এ অকৃত্রিম কষ্ট কি আমাদের কোন সমাধান দিচ্ছে? এ কষ্ট কি ঐ মানুষগুলকে রক্ষা করবে যারা ধর্ষনের স্বীকার হচ্ছেন? যদি না লাগে, তাহলে ধর্ষনের প্রশ্নে, অপরাধের প্রশ্নে এ ইমোশানের মূল্য কী? নিশ্চিতভাবেই ইমোশান আমাদের সমাধান দেবে না। তাই না? ব্যাপারটা বোঝা জটিল কিছু না। সহজ সমীকরন। বাসায় যদি আগুন লাগে, তাহলে আগুন লাগায় 'আমার অনুভূতি কী' - এটা জেনে কারোরই তেমন উপকার হয় না। আমি ভীত-স্বতন্ত্র, ক্রুদ্ধ কিংবা বিপর্যস্ত হতে পারি, আমার মেন্টাল ব্রেকডাউন হতে পারে, সেটা যৌক্তিকও হতে পারে, কিন্তু এ থেকে আমি সমাধান পাবো না।

আসলেই যদি আমরা এ সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান চাই তাহলে সমস্যার উৎস, নিয়ামক, অনুঘটক এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণের

উপায় খুজে বের করতে হবে। এক লাইনের মুখস্থ সমাধান কিংবা আবেগসর্বস্ব প্রতিক্রিয়ায় কাজ হবে না। আমার অনুভূতি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাতে বাস্তবতা বদলায় না। বাস্তবতাকে বদলাতে হয়।

কিভাবে ধর্মের এ মহামারী বন্ধ করা যায়?

এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আমাদের নিজেদের সাথে সং হতে হবে। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমাদের শরীরের একটা অংশে পচন ধরে গেছে অনেক আগে। পচতে থাকা রক্ত, মাংস আর পুঁজের গন্ধ উপেক্ষা করার কোন সুযোগ আর আমাদের নেই। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে যারা এ ধর্মগুণ্ডা করেছে তাদের অধিকাংশই আপনার আমার মতো মানুষ। সাধারণ মানুষ, গৃহী মানুষ, ভালোমন্দের সহজাত সক্ষমতা রাখা মানুষ। আমরা যে অপরাধগুলো দেখছি সেগুলোও অন্য কোন ভুবনের পৈশাচিকতা না, বরং নিতান্ত মানবিক নিষ্ঠুরতা। এ অপরাধগুলো ব্যাখ্যাহীন কোন বিকার না, বরং এর পেছনে ভূমিকা আছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, মনস্তত্ত্ব, নারীপুরুষের সম্পর্কের আদিম অবধারিত রসায়ন, এবং আমাদের বর্তমান সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের বাস্তবতার।

এ সত্যগুলো স্বীকার করার পরই কেবল গোলকধাঁধা থেকে বের হয়ে আমরা এগোতে পারবো। এবং খুঁজে নিতে পারবো সত্যিকারের সমাধান।

অন্যান্য সমস্যার মত এ সমস্যার সত্যিকারের সমাধানও আছে মানবজাতির স্রষ্টার নির্ধারিত দ্বীন ইসলামের মাঝে। ইসলামী শরীয়াহ বিচ্ছিন্নভাবে কোন ব্যক্তি, পোশাক কিংবা লিঙ্গের দিকে ফোকাস না করে একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা দেয় যা শুধু ধর্ম না, সব ধরনের যৌন অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করে স্থায়ী সমাধান দেবে। এক লাইনের প্রেসক্রিপশনের বদলে ইসলামী শরীয়াহ এ সমস্যার সমাধানকে অ্যাপ্রোচ করে বহুমাত্রিকভাবে। ইসলাম আমাদের বেশ কয়েক ধাপে এ সমস্যার সমাধান দেয় -

- নৈতিকতার শক্ত ভিত্তি। বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গ ও যৌনতার ব্যাপারে। এমন নৈতিকতা যা অপরিবর্তনীয়, যুগের সাথে, ট্রেন্ডের সাথে তাল মিলিয়ে যা বদলায় না।
- কঠোরভাবে নারী ও পুরুষের মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণ করা
- পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখা।
- নারীদের শার'ঈ পর্দার হুকুম মেনে চলা
- বিয়েকে উৎসাহিত ও সহজ করা
- মাহরাম বা পুরুষ অভিভাবক ছাড়া নারীদের বাইরে চলাফেরা নিরুৎসাহিত করা
- পর্নোগ্রাফিসহ সব ধরনের যৌনউত্তেজক এবং অশ্লীল গান, ছবি, কথা, চিত্রায়ন ইত্যাদিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা। ইসলামী শরীয়াহ নির্ধারিত শালীনতার সংজ্ঞা অনুযায়ী, ক্রমাগত পাল্টাতে থাকা সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী না।
- ধর্মকের দৃষ্টান্তমূলক ও দ্রুত শাস্তি কার্যকর করা।
- স্বচ্ছ বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

এটি হল এমন এক পরিপূর্ণ ও পরীক্ষিত কাঠামো যা সামগ্রিকভাবে ফলাফল এনে দেবে। কিন্তু সমাধান গ্রহণ করতে হলে মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপ করা, সবার ওপর মানুষকে সত্য মনে করা পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক কিছু বিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে হয়। বিসর্জন দিতে হয় প্রগতি, উন্নতি ও আধুনিকতার নামে শেখানো ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন আর অবাধ যৌনতার মত ধারণাগুলো। এ সমাধান গ্রহণ করতে গেলে কথা বলতে হয় বিপদজনক কিছু সত্যের পক্ষে। স্বীকার করতে হয় যে সমস্যাটা

সিস্টেমিক। সমাধান আনতে হলে তাই বদলাতে হবে সিস্টেমকেই। মানবরচিত শাসনব্যবস্থার বদলে আনতে হবে ইসলামী শারীয়াহ। আর যে মুহূর্তে আপনি বা আমি এ সত্যকে বিশ্বাস করা শুরু করবো, বিশ্বের রাজা-বাদশাহদের কাছে আমরা শত্রু হয়ে যাবো। অথবা নিজ প্রবৃত্তিই আমাদের বিরোধিতা শুরু করবে। কারন ইসলামী শারীয়াহ হয়তো আমাদের অনেক কামনা-বাসনার বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

তাই আমরা সমস্যার সমাধান খুঁজি না। কেবল সমস্যা নিয়ে কথা বলি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রেইপের খবর পড়ি। শোকাহত, ক্রুদ্ধ, স্তব্ধ, বিপর্যস্ত হই। মূল প্রশ্নের জবাব খোঁজার বদলে আটকে থাকি হালকার ওপর ঝাপসা স্লোগানবাজি, কোন একটা কিছু নিয়ে ত্যানা প্যাচানো আর "আপনার অনুভূতি কী" জাতীয় আলোচনাতে। আমরা সামগ্রিকভাবে সমস্যার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে কথা বলাকে এড়িয়ে নিয়মিত সাময়িক ক্রোধ, শোক বুকে আর মুখে নিয়ে ঘুরে ফিরি।